তারিখ ... 3 JUL ...
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ...

সমকাল

প্রাথমিক পাসের পর বিয়ে হয়ে যায় ৮০ ভাগ মেয়ে শিক্ষার্থীর

ফরিদপুরে পদ্মার চর ১

■ রাশেদ মেহেদী ও হাসানুজ্জামান, *ফরিদপুর পদ্মার চর থেকে ফিরে*

বাড়ি থেকে ওদের বের হতে হয় সেই কাকডাকা ভোরে। গায়ে ময়লা জামা। কারও কোলে বই-খাতা, কারও বা পিঠে ধুলোয় মলিন বইয়ের ব্যাগ। হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে ট্রলারঘাট পর্যন্ত যেতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। সকাল ৮টায় ইঞ্জিনচালিত নৌকা ছাড়ে ফরিদপুর শহরের উদ্দেশে। সেই নৌকায় চর থেকে 'মরা পদ্মা'র আঁকাবাঁকা জলস্রোত পার হয়ে শহরের ঘাটে পৌঁছতে লাগে আরও দু'ঘণ্টা। স্কুল শুরু হয় সকাল ৯টায়। কিন্তু ওদের স্কুলে পৌঁছতে বেজে যায় প্রায় সোয়া ১০টা।

স্কুল চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। কেউ কেউ বাসা থেকে সামান্য খাবার নিয়ে আসে। বেশিরভাগই দু'চার টাকার বিস্কুট, চানাচুর খেয়ে দিনভর ক্ষুধা চাপা দেয়। ৪টায় স্কুল ছুটি হলে আবার ফেরার তাড়া। ছুটতে ছুটতে শহরের ঘাটে নৌকায় ওঠে। এরই মধ্যে ডুবতে শুরু করে সূর্য। যখন নর্থ চ্যানেল ট্রলার ঘাটে পৌঁছে, ততক্ষণে সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে আসে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিজ নিজ গ্রামে ফিরতে হয়। বাড়িতে ফিরলে সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়। তখন আর ক্লান্ত শরীরে বই নিয়ে পড়তে বসা হয় না। চোখজুড়ে নামে ঘুম। এই চিত্র ফরিদপুরের পদ্মার চরের কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীদের। তারা ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

প্রায় দেড় যুগ আগে ফরিদপুরের পদ্মার চরে জনবসতি শুরু হয়। এই ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

প্রাথমিক পাসের পর বিয়ে হয়ে যায়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

চরে তিনটি প্রাথমিক স্কুল থাকলেও নেই একটিও হাই স্কুল। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রাথমিকের পর আর হাই স্কুলে যাওয়া হয় না। হাতেগোনা যে ক'জন যায়, তাদের প্রতিদিন দীর্ঘ 'মরা পদ্মা' পাড়ি দিয়ে যেতে হয় ফরিদপুর শহরের শেষ সীমানার চর টেপাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে।

এই চরের বিরাশি বছর বয়সী আবদুল কাদের দুঃখ করে বলেন, 'স্কুলে যাওয়ার এত ঝক্কি-ঝামেলার কারণেই প্রাথমিক পাসের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আর হাই স্কুলে যাওয়া হয় না। বিভিন্ন কাজে ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এভাবে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসা সম্ভব হয় না। হাই স্কুল না থাকায় মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। চরে একটি হাই স্কুল থাকলে মেয়েরা অন্তত ম্যাট্রিক পাস করতে পারত।'

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য মরিয়ম বিবি লিপি জানান, 'সত্যিকার অর্থেই এই গ্রামের প্রায় ৮০ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১৫ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক পাস করলেই বাবা-মা মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ ছাড়া কিছু করারও থাকে না। অধিকাংশ বাবা-মা দরিদ্র। কেউই মেয়েকে বেশিদিন ঘরে বসিয়ে রাখতে চান না। আর বসিয়ে রেখে লাভই বা কি? হাই স্কুল নেই। পড়াবেন কোথায়? চর থেকে ফরিদপুর শহরে স্কুলে যাতায়াত করা মেয়েদের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। প্রতিদিন যাওয়া-আসার খরচ দেওয়ার সামর্থ্যও অনেক বাবা-মায়ের নেই।'

সরেজমিন গিয়ে ওই চরে বাল্যবিয়ের চিত্রটা ভয়াবহভাবেই চোখে পড়ল। কৃষি মজুর আবদুর রব শেখের মেয়ে বিউটি আখতার। প্রাথমিক পাসের পর শহরের স্কুলে সে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় বসার আগেই বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বিউটি। 'পরীক্ষাটাও দেওয়া হয়নি স্যার। আমি সপ্তম শ্রেণি পাস।' বিউটির যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর আট মাস। এখন সে ১৬ বছরে পড়েছে। ২৬ বছর বয়সী স্বামী বিয়ের পরই চলে গেছেন লেবানন। বিউটির মতো লাবণী আক্তারেরও বিয়ে হয়েছে ১৪ বছর বয়সে। ১৫ বছরেই মা হয়েছে সে। এখন তার কোলে আড়াই বছরের শিশু লামিয়া। পাশে আরও দু'জন ডালিয়া, সুফিয়া। ওদেরও বিয়ে হয়েছে প্রাথমিক পাসের ছয় মাসের মধ্যে।

অবশ্য চরের এই গ্রামে আঁখি আক্তারের মতো ব্যতিক্রম দু-একজনও আছে। যারা দৃঢ় মনোবল নিয়ে বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে পড়ালেখার লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। আঁখি আক্তারও দরিদ্র কৃষকের কন্যা। পড়ছে চর টেপাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে। আঁখি বলে, 'স্যার, আমি কিন্তু বিয়া বসি নাই। দু-একবার সম্বন্ধ আসছিল, না করে দিছি। ম্যাট্রিক পাস না দিয়া বিয়া বসুম না।' ম্যাট্রিক-পাসের পর আর পড়ালেখা করবে না কেন জানতে চাইলে চোখ বিস্ফারিত করে আঁখি বলে, 'আমি তো কলেজেও পড়তে চাই স্যার। কিন্তু সেই কপাল নিয়া তো জন্মাই নাই। দোয়া কইরেন স্যার, ম্যাট্রিকটা যেন ভালো করে পাস দিতে পারি। ভালো পাস দিলে কলেজে যাওয়ারও চেষ্টা করমু।'

আঁখি প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার বর্ণনা দিলো এভাবে : সেই কাকডাকা ভোর থেকে রাত ৮টা, স্কুলে যাওয়া-আসাতেই কেটে যায়। সন্ধ্যার আঁধারে কিছু বখাটেরও উৎপাত আছে। তবে ঘাট থেকে ওরা দল বেঁধে আট-দশজন আসে বলে বখাটেরা বেশি উৎপাতের সাহস দেখায় না। আঁখি আক্তারের মতো রেবেকা, সুফিয়ারাও সপ্তম, অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। ওদের চোখে-মুখে শঙ্কা, যে কোনো মুহূর্তে তাদের বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

চরের গ্রামে হাই স্কুল নেই কেন? জানতে চাইলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মরিয়ম বেগম বলেন, 'অনেকবার উপজেলায়, জেলায় জানানো হয়েছে। কিন্তু হাই স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে তো আর হাই স্কুল করা সম্ভব না।' গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা আবদুল কাদের বলেন, 'ফরিদপুরের অনেক বড় বড় লোক ঢাকায় থাকেন। তাদের একদিনের আয় নাকি কোটি টাকার বেশি। অনেক বড়লোকের বিঘার পর বিঘা জমি এই চরেও আছে। বছর যাচ্ছে, তাদের জমি বাড়ছে। তারা চাইলে একটা হাই স্কুল বানানো কোনো ব্যাপার নয়। তাদেরকেই জিজ্ঞেস করেন, চরে হাই স্কুল কেন হচ্ছে না?'

গ্রামের বেশ ক'জন জানান, চরের তিনটি প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস হয় মাত্র দু'ঘণ্টা। স্কুলগুলোর শিক্ষকরা ফরিদপুর শহর থেকে আসেন প্রতিদিন। ৩৬ নম্বর নারার টেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী এবং দু'জন অভিভাবক জানান, ফরিদপুর শহর থেকে চরে আসার একমাত্র ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ছাড়ে সকাল সাড়ে ৯টায়। চরের ট্রলার ঘাটে আসে সাড়ে ১১টায়। শিক্ষকরা স্কুলে আসেন ১২টার পর। সাড়ে ১২টায় ক্লাস শুরু হয়। আড়াইটার মধ্যে ক্লাস শেষ করে শিক্ষকরা আবার ছোটেন ট্রলারঘাটের দিকে। বিকেল ৪টায় নৌকা ছেড়ে যায়। তারা চলে যান শহরে। ফলে প্রতিদিন দু'ঘণ্টার বেশি ক্লাস নেওয়ার সুযোগ নেই। চরের দুরবস্থার মধ্যে শিক্ষকরা থাকতে চান না। থাকার বাধ্যবাধকতাও নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুলশিক্ষক জানান, শহর থেকে চরে যাতায়াত ব্যবস্থার সংকটের কারণেই স্কুল দুপুরের পর শুরু করে দু'ঘণ্টার বেশি চালানো যাচ্ছে না। তবে এই চরের শিশুরা খুব মেধাবী। দ্রুত পড়া বোঝে, মুখস্থ করে চটপট। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এদের সাফল্য বেশ ভালো।